যুগলবন্দী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

এই সব পদ্য

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কশ্চিৎ গণ্ডগ্রাম এই বহড়ু, ডাকনাম বড়ু। লোকে শুধুলে বলি, জয়নগর-মজিলপুরের নাম জানেন ? ঐ যে, যেখানে মোয়া। কলকাতার লোক সঙ্গে সঙ্গে মাথা কাৎ করে। তৎক্ষণাৎ তার আগের ইস্টিশানের গল্প বলি অর্থাৎ ঐ বড়ুর গল্প।

দাদামশাই-এর পুরনো বাড়ি ছিলো ভুঞ্জবাবুদের বড়োবাড়ির গায়ে। তাঁদের দুর্গামণ্ডপ ছিলো। তাঁদের বিরোৎ বিরোৎ বাগান আর পুকুর ছিলো। তাঁদের গেটের মধ্যে কাছারিবাড়ির লাগোয়া বাগানে ফুলগাছ ছিলো বিস্তর। আমরা সেখানে বাতাবিলেবুর বল খেলতে যেতুম। গেটের সামনে আমলকিতলা ছিলো, তার পেছনে ছিলো ইটখোলা। মনে পড়ে, কোন্ একটা পুকুরের মাছ, মাথাসার—গায়ে কোনো গত্তি থাকতো না। গাঁয়ের মানুষ সে-মাছ দেখে ভয় পেতো। ভূত-লাগা সেই পুকুরের মাছ, জালে উঠলে, আমরা ছোটরা সব হুমড়ি খেয়ে পড়তুম।

ওটা ছিলো দাদামশাইদের শরিকি বাড়ি। আমার জন্ম ঐ বাড়িরই সার্বজনীন আঁতুরঘরে কোনো। একদিন দেখলুম, ওঁরা রাতারাতি এ-ঢিবি ও-ঢিবির দখল নিলেন—ছাঁচতলা দিয়ে মাটি ভাগ হতে থাকলো, দুঘরা মাটির বাড়ির মাঝখানে বেড়া উঠলো বাঁশকাঠির, তার তল চেপে এক বিঘৎ করে রাঙচিতা আর মেন্দি ঝোপ। একান্নবর্তী পরিবার ফেটে চৌচির হয়ে গেলে, আমার নিজস্ব দাদামশাই একদিন বড়ুর ইস্টিশানের কোলের কাছের বাড়িতে উঠে এলেন। মন-মন কাজে এ-বাড়ি তিনি যে কবে তৈরি করতে শুরু করেছিলেন, কেউ জানতো না ! ধানী জমি, মাটি ফেলে উঁচু আর বাসযোগ্য করে তাঁর বাড়ি উঠলো। রেল কোম্পানির জমির ঠিক গায়েই। হলুদে-শাদায় মেশা 'মৃণালিনী কুটির'—দিদিমার নামে। যতদূর মনে পড়ে দাদামশাই-এর হাতে এর নামকরণ হয়নি, হয়েছে পরবর্তী কালে কোনো, তাঁর পুত্রদের হাতে—মাতৃস্মৃতি জাগ্রত রাখার জন্য। দিদিমা কলেরায় মরেছিলেন কলকাতার বাসাবাড়িতে—মামাদের তিনতলার ঘরে। আমাদের চোখের ওপর সাপটে পেরেক পোঁতা হলো। আমরা কেউ একা তিনতলায় উঠতাম না—বিশেষত ঠিক দুক্কুরবেলায়।

গাঁয়ের ছেলে হলেও মনে ভয় ছিল পুরোদস্তুর। চোর ছ্যাঁচোড় ডাকাত আর ভূতের ভয়। আর একটা ভয় পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় ডুবে থাকতো—সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে গেলেই ডোবাবে—যদি পা লাগে ডুবো মন্দিরের চুড়োয়। সব প্রতিষ্ঠিত পুকুরের মাঝখান বরাবর একটা পাতালপুরীর মন্দিরের কথা বিশ্বাস করতে কে বা কারা যেন আমাদের ছোটবেলায় শিখিয়েছিল।

বাবা মারা গেলেন যখন আমার নামমাত্র বয়েস, তারপর থেকেই মামাবাড়ির গলগ্রহ—মা আর ছোটভাই মামার সংসারে...কলকাতায়। আর আমাকে দাদু রেখে দিলেন তাঁর কাছে একাকী, মানুষ করবার জন্যে। সে-বাড়িতে মানুষ ছিলো তিনজনই। দাদু আমি আর আমার এক বালবিধবা মাসি। বিশাল বাড়ি, দু দুটো অন্ধকার বাগান, দুটো পুকুর, আটটা পুকুরপাড়, পাড় ভর্তি মাছরাঙার গর্ত, গোয়াল ভর্তি গাই-বাছুর—এই সব। গোয়াল আর বাগানের কাজ দেখতো ওতোরপাড়ার হৈদরদা। দাদু করতেন হোমিও ডাক্তরি, আমি অ্যাপ্রেনটিস কম্পাউণ্ডার।

BANGLADARSHAN.COM

পেরনাম জানাতো। অমন সদাশয় মানুষ, যেমন মন তেমন দেহ, অমন রূপবান বৃদ্ধ আমি জীবনে খুবই অল্প দেখেছি। ইস্কুল মাস্টারি ? হ্যাঁ, তাও করেছেন—আসলে ইস্কুল গড়তেই হাত লাগিয়েছেন বেশি করে। কাছা খুলে দান করেছেন—যতটুকু ছিলো, তাঁর মৃত্যুর পরে শুনেছি, ধার করেও দান করেছেন অনেক অনেককে।

দাদুর গায়ে এক ধরনের চন্দনের গন্ধ ছিল—ভোরবেলাকার পূজো থেকেই লেগে থাকতো তা। দিনরাত্তির সব সময়েই এক সৌরভ তাঁকে ঘিরে থাকতো সুসংবাদের মতন। স্ত্রী গেলেন, একটি দুটি মেয়ের বর বাদে চার চারটি মেয়ের কপাল পুড়লো। তখনো তিনি সেই চিরন্তন সন্ন্যাসী, অপরকে নিয়ে ব্যস্ত, অসুখী—অসুস্থকে নিয়ে উন্মাদ—সন্ন্যাসীর মতন স্বার্থ নিয়েও নয়।

তিনি আমাকে স্বাভাবিক ভাবে মানুষ করে তুলবার জন্যে তাঁর কাছে রেখেছিলেন, আর আমি যাচ্ছিলাম ক্রমাগতই বেঁকে চুরে। আমার হওয়া হয়নি, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া হয়নি কিছুই। এক ঐ উদাসীনতা ছাড়া।

সারাজীবনটাই মনে হয়, খুব একা ছিলেন তিনি। আমিও অজ্ঞাতে ঐ একা থাকার দীক্ষা নিয়ে থাকতে পারি। বাবার কথা তেমন বিশেষ মনে পড়ে না—শুধু যেখানে ঐ বড়ুর বিশ্বজাঙ্গালে তাঁকে পুড়িয়ে এসেছিল এক শিশু—সেখানে গেলে তার পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে পার হতে পারিনি কোনদিন। চোখকান বুজে ঐ আধ মাইল রাস্তা আমাকে দৌড়ে যেতে হতো। কী জানি কেন ? প্রিয়জনে তো ভয় থাকার কথা না, তবু ভয় হতো। মনে হতো, তিনি আমায় খপ্ করে ধরে ফেলবেন। ধরেই কিছু নাছোড়বান্দা কথা—তাহলে ? আমি মরে যাবো।

BANGLADARSHAN.COM

আজো মনে হয়, তাঁকে আমি চিনতে না পারলেও তিনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। সঙ্গে আছেন। আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করছেন। তাঁকে ভালোবাসি না, ভালোবাসার সময়ই পাইনি। তাঁকে ভয় করি। আজো বিপদে পড়লে তাঁকে ডাকি। মনে হয়, তিনি তাঁর দুর্দান্ত কালো মুখচোখ নিয়ে আমার রাহুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন। স্পষ্ট দেখতে পাই, তিনি আমায় বাঁচিয়ে রাখছেন। নয়তো কবেই আমার মরে ভূত হয়ে যাবার কথা।

ছোটবেলায় ঐ ইস্টিশান, দোলমঞ্চ, গাঁয়ের চাষাভূষোর সঙ্গে গাছপালা, পানাপুকুর—পরিপ্রেক্ষিতসুদ্ধু এক পাড়া-গাঁ আমার মধ্যে চেপে বসেছে। তার থেকে পরিত্রাণ কখনো পাই নি।

ছোটবেলায় একদিন রেললাইন ধরে ঝুলন্ত চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়েছি—যেদিকে পেরেছি গেছি। সেই চাঁদ আর ছাদের ওপর সপ্ বিছিয়ে রবিঠাকুরের গান শোনাতো পরবর্তীকালে মাসির মেয়েরা—তখন দাদু নেই, অথচ আমি তাঁর বাড়িতে আছি, সঙ্গে দাঙ্গালাগা এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছে কলকাতার মাসি, তাঁর ছেলেমেয়েরা—তখন ধীরে ধীরে যেন সামাজিক রান্নাবান্নার ভেতর থেকে মানুষের মতন এক সম্পর্ক দানা বাঁধছে। ঐ প্রথম কলকাতার স্পর্শ পাচ্ছি। আমার গ্রাম থেকে তখনো অনেক রেলগাড়ি কলকাতা শহর ছুঁয়ে চু কিৎ কিৎ খেলছে। ক্বচিৎ কখনো সেখানে গেছি দাদুর হাত ধরে। শিয়ালদা থেকে সটান ঘোড়ার গাড়ি। সেখানে ঘোড়ার গুয়ের গন্ধে আমার শহরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এখনো ফিটন দেখলে পা থমকে যায়। সহিসের সঙ্গে দু-চারটে বাক্যালাপ

করি। সহসা তাকিয়ে দেখি, সেদিনের মতন একটা রাস্তা যেন জলপ্রপাত, তার গা থেকে গাড়িঘোড়া সব হুড়মুড় করে ধারাবাহিক গড়িয়ে পড়ছে। নিচে গভীর খাদ। হাঁ করে আছে কলকাতা শহর। তার ক্ষিদে সাংঘাতিক।

এই কলকাতা যখন আমাকে খেলো তখন আমি ইস্কুলে পড়ি। বাগবাজারের কাশিমবাজার পলিটেকনিক। মামার বাড়ি থেকে কাছে। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় সমূহ টান। মাস্টারেরাও মন্দ বলেন না। মামা আশা রাখেন, ছেলে বড়ো হবে, মাতব্বর হবে, বাড়ির নাম রাখবে।

বাড়ি কোথায় ? বাড়ির আবার নাম কী ? রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐ বয়েসেই জড়িয়ে গেলাম। একা থাকার অপরূপ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই মনে হয় আজ। কিছু বুঝি না, কিচ্ছু জানি না। বোঝানো হলো, রাতারাতি স্বাধীন দেশ স্বাধীনতর হবে ইত্যাদি ইত্যাদি—ধনী দরিদ্র থাকবে না, সম্পদের সমবণ্টন হবে। স্বর্গের একটা গোলকধাম-মার্কা ছবি আমাদের, বালকদের স্বপ্নের দোরগড়ায় লটকে দেওয়া হলো। বলছি না, গুরুদেবরা ইচ্ছে করেই দিয়েছিলেন। ভুল বুঝে এমনটা বুঝিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের দোষ নেই। মনে হয় কিছুকাল স্বর্গ খুঁজতেই কাটল—সেই সঙ্গে সামাজিক মানুষের গা ক্ষতবিক্ষত। ফেরার পথ থাকে না, তবু ফিরতে হলো। আবার সেই হলুদ পাকা কুঁচো-করা ঘাড় মুখ গুঁজে স্বার্থ গোছানো। ইস্কুল ডিঙিয়ে কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজের দিনগুলি স্মৃতি থেকে সরানো যায় না, কিছুতেই।

BANGLADARSHAN.COM

পড়াকালীন সময়ে সহপাঠীদেরই মধ্যে অনেকেরই খেলার বাতিক ছিল। জনাকয়েক তো রীতিমতো বিখ্যাত। অলোকরঞ্জন দু ক্লাশ উঁচুতে পড়তেন, শঙ্খ ঘোষ তারও এক ক্লাশ, শিশির দাশ আমার সহপাঠী। এখন দিল্লির বিখ্যাত ডাক্তার অধ্যাপক সে। দেশ-এ তার কবিতা বেরুলে অধ্যাপকগণ আলোচনা করতেন আর আমাদের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যেত কে কীভাবে তার নেকনজর কাড়তে পারে। আমি তার পাশে বসতে পেলে উজ্জ্বল হয়ে উঠতাম। ঘুণাক্ষরে ভাবিনি, একদিন পদ্য লিখতে পারবো। তারপর একদিন দীপেনের (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) মাধ্যমে দীপক মজুমদার, তার মাধ্যমে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ। সুনীলের তখন বৃন্দাবন পাল লেনে বাসা। আমার মামাবাড়ি থেকে কাছেই, প্রায় রোজ সেখানে আড্ডা মারতে যাই। সেখানে একে একে আনন্দ, ফণিভূষণ, মোহিত, শিবশম্ভুর সঙ্গে আলাপ। সন্দীপনের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কবে যেন আলাপ হয়ে গেছে। তন্ময়ের সঙ্গে। আমরা কোনো কোনো দিন দেশবন্ধু পার্কের জলের ধারে কোনোদিন বা গাছতলায় বসে গল্প কবিতা শুনি। মতি তার প্রথম দিককার অনেকগুলো গল্প আমাদের ঐ ধরনের আড্ডায় পড়ে। কবিতা পড়ে সবাই—আমি ছাড়া, তন্ময় ছাড়া। স্মরজিৎ অনেক পরে একদিন একটি গল্প পড়ে শুনিয়ে গেলো হঠাৎ। ফণীর বই বেরুচ্ছে, আমরা মদৎ দিচ্ছি। ও যাকে পারছে তাকে কবিতা উৎসর্গ করে চলেছে। আমাকেও একটা দিয়েছিল বলে মনে পড়ছে। তখন তো আর লিখি না, অনেক কাকুতি মিনুতির পর ও দিতে পেরেছিল। এখন ভাবলে হাসিই পায়। তখন গাঁয়ের লোক হিসেবে ব্যাপারটা চলে গিয়েছিল বলতে হবে। লুকিয়ে গল্প লিখে ফেললুম একটা ভাইজাগের ডলফিন্‌জ্‌ নোজের উপর। আনন্দবাজার রবিবাসরীতে ছাপা হলো। উত্তেজিত হয়ে আরেকটা লিখে পাঠালাম, সঙ্গে সঙ্গে ফেরত। ছদ্মনামেই গল্পটা লিখেছিলাম। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ আমার পাড়াগাঁর স্মৃতি নিয়ে এক দু পাতা করে একটা আখ্যান লেখা শুরু করে দিই। দু দশ পাতা—যেদিন যেমন হয়

পড়ে শোনাই। কেউ ভালো বলে কেউ চুপ করে থাকে। আমি দমি না—একদিন শেষও হয়। নাম দিই ‘কুয়োতলা’। বছর দেড়েক প্রকাশকের ঘরে ধাক্কা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত বেরোয়। একটু অদ্ভুত ধরনের বই হিসেবে অল্পসল্প নামও করে। ঐ পর্যন্ত।

ঐ ধরনের আড্ডাতেই বোধ করি উত্তেজিত হয়ে, পদ্য লিখবো মনে-মনে এক রকম স্থির করে ফেলি। তখন তরুণ রচনার অগ্নি, মানেই কৃত্তিবাস। অন্যদিকে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকা। সঞ্জয়বাবুর পূর্বাশা টিম টিম করে জ্বলছে। রাত্তিরবেলা বাড়ি ফিরে হিসেব মিলিয়ে একটা সনেট খাড়া করি। পরের দিন সুনীলের বাসায় যাই। লেখাটা অতি সাধারণ ‘যম’, ওর কাছ থেকে কবিতার ঠিকানা নিয়ে বুদ্ধদেবকে পাঠাই। উনি চিঠি দেন, সামান্য সংশোধন করে ছাপবেন। হাতে স্বর্গ পাই—কিংবা মনের মধ্যে কী যেন এক অবাস্তব হাওয়া বাড়তে থাকে। প্রায় দৌড়ে সুনীলের কাছে গিয়ে চিঠিতা দেখাই এবং দু-তিনটে টানা গদ্যে লেখা ‘সুবর্ণরেখার জন্ম’ আর ‘জরাসন্ধ’। সুবর্ণরেখা কৃত্তিবাসের জন্যে রেখে দিলে পরের ডাকেই জরাসন্ধ বুদ্ধদেবের কাছে পাঠাই। পদ্য লেখার আকস্মিক জন্ম, প্রকৃতপক্ষে সেদিনই। কোনো প্রেরণা না, কোনো সনির্বন্ধ ভালোবাসায় না—শুধুমাত্র চ্যালেঞ্জ-এর মুখোমুখি এসে এইসব পদ্য লেখা।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা কলকাতা খেলাঘরে॥

কবিতার মধ্যে খুবই উপদ্রব সম্প্রতি বেড়েছে।
কোনো গুপ্তচর শব্দ মুহূর্তে ভণ্ডুল করে দেয়,
উজ্জ্বলে মলিন করে ক্ষয়া ও খর্বুটে বর্ণমালা
পাইকার এবং করে সমস্তরকম নাশকতা
সজ্জা, সিঁড়ি, প্লীহা ফাটে, চোরাজল নিশ্চিত নষ্টের
মূলে টেনে আনে আর ধ্বংস করে, কাটাকুটি করে।

আমার কলকাতা আজ নিষ্প্রদীপ, কবিতারই মতো
মহড়ায় প্রাণপণ, অসতর্ক নিষ্ফল বাস্তবে
কবিতারই মতো তার ডালপালা সর্বস্ব রয়েছে...
নেই, যাকে বলে অগ্নি, বলে প্রাণ, হরিৎ উদ্গার!

তবুও খড়ের স্তম্ভে-স্তূপে ফোটে একাকী জীবিত
কোঁড়ক, স্বপ্নের মধ্যে আকাশেরও বিবৃতি সঠিক;
সেই পুরাতন চাঁদ সাক্ষী রেখে হৃদয়স্থাপন
করে হুলুস্থূল প্রেম, কবিতা কলকাতা খেলাঘরে॥

BANGLADARSHAN.COM

সামনে মানুষ

পিছন ফিরলেই দেখি কুশ্রী কুশ্রী কুশ্রী একতাল
প্রকৃতি-পাগল মেঘে লেগে আছে বিদ্যুতের ছটা
যেন গুঁড়ো চুল কোনো উড়ন্ত বিধবা
চাঁদের পিছল স্নেহ
কিংবা নৃত্যে বেসামাল জল
হাওয়ার পাটের ফেঁসো
অবিশ্রান্ত ওড়াউড়ি করে
পিছন ফিরলেই দেখি এইসব
সামনে মানুষ॥

BANGLADARSHAN.COM

কলকাতা কবির মৃত্যু সমর্থন করে

মৃত মুখ, তাকে আমি কুয়োর জলের মতো স্তব্ধ মনে করি
পাতালের তাপ যদি কিছু থাকে, তাকেও স্থিরতা
কঠিন আঙুল তুলে ঘুম পাড়ায়, ধ্যানমগ্ন করে
আমি ভয় পাই, আমি মুখ ঢাকি, বাস্তবে তবুও
কবির গণনা বলে, ও মুখ-পাষাণই প্রিয়তম
রূঢ় সুষমার পংক্তি, ওই শব্দ, স্মৃতির জননী...
কিন্তু সে কবিও যান হাতে-গড়া শস্যক্ষেত্র ছেড়ে একদিন
পাকা ও প্রসন্ন ফল ঝরে পড়ে তপোক্লিষ্ট ভুঁয়ে
শীতের বাদাম করে ওড়াউড়ি, ময়দানের ঘাস
গভীর আগুনে যায় উড়ে-পুড়ে...দেখে মনে হয়,
কলকাতা কবির মৃত্যু সমর্থন করে॥

BANGLADARSHAN.COM

দক্ষিণে তাকালে অন্ধ

দক্ষিণে তাকালে অন্ধ, অন্যদিকে এখনো বন্ধুতা–
এভাবে কি বাঁচা যাবে? যা নিষিদ্ধ তাকে দেখতে প্রাণ
বালকেরও ছুটে যায়, আমি তো প্রৌঢ় ও পারঙ্গম!
দক্ষিণে তাকালে অন্ধ, অন্যদিকে তবুও, বন্ধুতা...

মানুষের কাছে আজ, যেতে হলে, দুটি দিক আছে–
স্থায়ী ও রহস্যময় একটি দিক বন্ধ ও জটিল।
দুটি দিক, ভালো-মন্দ, পাপ ও পুণ্যের–দূরে কাছে
মানুষমাত্রেরই আজ, যেতে হলে, দুটি দিক আছে।

একটি, যে জন্মেছে পাপে, তাকে করা পুণ্যে সমুজ্জ্বল
পূজার মতন খাঁটি, পরিপাটি, অতসী চন্দনে।
অন্য, যে জন্মেছে পুণ্যে তাকে করা পাপে নিমজ্জিত
কিন্তু যে অর্ধেক পাপে অর্ধ পুণ্যে তাকে কোন্ ছুতা

ধরতে হবে বাঁচতে গেলে? প্রেমে-কামে সন্ন্যাসে পীড়িত,
দক্ষিণে তাকালে অন্ধ, অন্যদিকে এখনো বন্ধুতা॥

BANGLADARSHAN.COM

নীলিমার সোনালি আপেল

সোনালি আপেল থেকে আপেলের বুকের গভীরে
ঢুকে যেতে চায় বলে, শুয়ে থাকতে চায় বলে আর
মানুষের মধ্যেকার সমূল উদ্দাম ভালোবাসা
আমাকে টানে না কাছে, ছেড়ে দেয়, যেন ধূলাবালি
হাওয়ায় ঘূর্ণিতে ওড়ে, চলে যায় না-দেখার মতো
প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে, মানুষের সখ্য ছেড়ে দিয়ে
দূরে গুণমুগ্ধ মেঘে গা ভাসিয়ে নীলিমার দিকে–
যেন নীলিমাকে ভালোবাসে সে-ও গভীর গভীর
যেন নীলিমার কাছে যাবে বলে পথে বেরিয়েছে
যেন নীলিমারই লোক, আপেলের নয় অধিগত
চেনা নয়, নিরাত্মীয়, সোনালি আপেল–সে তো ভুলই॥

BANGLADARSHAN.COM

বস্তুর গ্রন্থনা থেকে এইভাবে

বস্তুর গ্রন্থনা থেকেই মুক্তি পেতে হবে
মুক্তি তো দেবার নয়, নিতে হবে প্রত্যক্ষে ছিনিয়ে
অথবা গোপনে কোনো মুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্য তার
অবিসংবাদী প্রেম, উপঢৌকনের মতো মেঘ
যারা ভেসে আসে কোনো খোলা মাঠে, অব্যর্থ হাওয়ায়
বস্তুর গ্রন্থনা থেকে বস্তুকেই মুক্তি পেতে হবে–
একদিন।
তা না হলে সবই ব্যর্থ–উদ্যোগ, উদ্যম, অভ্যর্থনা
জীবনধারণ ব্যর্থ, ব্যর্থ সব কৃত্রিম প্রকৃতি
কায়ক্লেশ, দুঃখসুখ, মনেপড়া, স্বপ্ন ঘুমেঘোরে
বালকের দোলমঞ্চ, ভাঁটফুল, মর্নিং-স্কুল
ব্যর্থ ক্ষয়রোগ আর রক্তের ভিতরে তার খেলা
অমরতা নাম্নী নারীটির ভ্রূমধ্যে আমার
চুম্বন দেবার কথা–দেবো না, দেবো কোনদিনও
–এইভাবে
বস্তুর গ্রন্থনা থেকে বস্তুকেই মুক্তি পেতে হবে॥

BANGLADARSHAN.COM

সমস্ত নক্ষত্র আজ নক্ষত্রের

সমস্ত নক্ষত্র আজ নক্ষত্রের ভিতরের ক্রোধ
বোঝাতে না পেরে যেন আরো দূরে চলে যেতে থাকে
অভিমানই এরকম অঘটন ঘটাতে সক্ষম–
এই ভেবে, মানুষেরও বুক অভিমানে ভরে যায়
মানুষ নক্ষত্র নয়, নক্ষত্রের মতো দূরে নয়
মানুষের মধ্যে তবু নক্ষত্রপুঞ্জেরা খেলা করে।

সেরকম খেলা থেকে প্রাপনীয় সমস্ত বোধের
জন্ম হয়, মৃত্যু হয়–মানুষেরই মধ্যে যেতে থাকে
মিশে তা মাটিতে যেন, শস্যে আর শ্যাওলার ভিতরে
ক্ষিপ্র ছুঁচ? কিন্তু সে তো মেশে না মাটিতে-রক্তে-হাড়ে
তাহলে ও ছুঁচ নয়, গভীর, ব্যাপক ম্লান প্রেম!
কিশোরজীবনে শুধু একবারই ছুঁয়ে যেতে আসে–
অকারণে...
সমস্ত নক্ষত্র আজ নক্ষত্রের ভিতরের ক্রোধ
বোঝাতে না পেরে যেন আরো দূরে চলে যেতে থাকে॥

BANGLADARSHAN.COM

উদাসীন, পড়েই রয়েছে

শব্দের নিজস্ব অনুতাপ তাকে পুড়িয়েছে জ্বরে
সে শুয়ে রয়েছে তার চতুর্দিকে কমলার খোসা
যেন সে নক্ষত্রহারা তরুণের মতো লাল চুল
কাঁধের উপরে ফেলে, উদাসীন, পড়েই রয়েছে...

এই পড়ে থাকা, এই পর্যটন-বিমুখ আত্মার
এই শুয়ে-বসে শুধু জব্দ হওয়া, এই মর্চে-ধরা
আকাশের নিচে থেকে, বাতাসের ছোঁয়া লেগে এই
মনপ্রাণ-সুদ্ধ ডুবে যেতে চাওয়া মৃত্যুর গভীরে!

BANGLADARSHAN.COM

বাগানে তার ফুল ফুটেছে

ওইখানে ওই বাগানে তার ফুল ফুটেছে কতো
জানতে পারি, ওর মাঝে কি একটি দেবার মতো?
একটি কিম্বা দুটির ইচ্ছে আসতে আমার কাছে
তাহার পদলেহন করতে সমস্ত ফুল আছে।
সব ফুলই কি গোষ্ঠীগত, সব ফুলই কি চাঁদের
একটি দুটি আমায় চিনুক, বাদবাকি সব তাঁদের
গাছ তো তাঁহার বাগানভর্তি, আমার রোপণ ছায়া–
প্রবীণ তাঁদের ভালোবাসা, আমার বাসতে চাওয়াই॥

BANGLADARSHAN.COM

আমি সুখী

ভুলে ভুলে ভুলে যাই, কোনোদিন মধ্যদুপুরের রৌদ্র পিঠে বয়ে
তোমার উদ্দেশে, শুধু একঝলক বিমূঢ় চোখের পক্ষপাত পাবো বলে
একঢাল সবুজ পাতার গায়ে রক্তচক্ষু ফুলের চমক
দিতে পারবো বলে ঐ আপার চাইবাসা...চলে যাই
আজ ভুলে ভুলে যাই বিকেলের সুঁড়িপথ হাস্যকরোজ্বল ছেলেবেলা
অন্ধকার ঘর জুড়ে ডাক-ছাড়া গান
ছাঁচতলায় পদশব্দ, সজিনার পাতায় ফিসফাস
আর রাঙা পা দুখানি করতলে–মন্দির প্রতিষ্ঠা যেন
বিশ্বাসের, উলুর, শাঁখের
ভালোবাসা থেকে দূরে শ্রেষ্ঠতার মহান পূজার
মন্ত্র যেন তোমার অস্পষ্ট কথা
চোখ চাওয়া, পাংশু হিম ঘুম...এইসব

BANGLADARSHAN.COM

আজ মৃত, শান্ত, দূর–আয়ত্তের মধ্যে তুমি নও, নওলকিশোরী
তুমি নিঃসঙ্গের সত্য সঙ্গ দিতে
স্বপ্নে মেলে দিতে তুমি গৃহগন্ধ, বাগান, পুকুর
বস্তুত বস্তুর খোঁজ দিতে তুমি মনীষা মিশিয়ে
কিন্তু আজ মৃত, শান্ত, বহুদূর–বাহ্যের আড়ালে...

আমি সুখী! তুমি জানো সুখ কাকে বলে?
ভুলে ভুলে ভুলে গিয়ে সুখী আমি, স্বতন্ত্র, স্বাধীন–
সুখী আমি। তুমি জানো সুখ কাকে বলে?

জানিনা কোথায় শব্দ

এ জলে নেভানো শব্দ, কার মতো–আমূল, অংশের
প্রসঙ্গে মেলাবে মুখ?
কালো কয়লা টুকরো যে অগ্নিকে
ধরে রাখে, তার মতো? নাকি তাম্রকূট নীল বিষ
নিশ্চিন্ত শিশিরে পড়ে মুছে যায় চোখের আড়ালে–
মানুষের মৃত মুখ জানি পাবো দুই পা বাড়ালে
যদি পা বাড়াই, যদি নেমে পড়ি ছাউনির পাড়ায়
টুপির পাহাড় যদি অলম্বুশ গাছপালা নাড়ায়
তখন শব্দকে কিছু খুঁজে পাবো, যা বাংলার ইট,
বানাবো মন্থর বাড়ি পারম্পর্যে ঘাড় ধরে, গেঁথে
তখন সনেট লিখবো কিংবা গায়ে পড়া চতুর্দশী
লোকে বলবে মিস্ত্রি বটে, ঘটে-পটে চূড়ান্ত স্বদেশী!
ঘুরে মরি গো-শকটে কিংবা যতো চাঁদ-খেকো গলির
নিশ্চিত সুড়ঙ্গে, পড়ে গুমোট গরম ইলেকট্রিক
গায়ে, বুকে হেঁটে যেতে শামুকের মতন করুণা
এবং যা লাগে, ছায়া, কিছু ফিরি–ছায়া কিছু ফেরে।

ওখানে কি শব্দ ছিলো? কলকাতা ধনসম্পদের
মতন স্বচ্ছন্দ শব্দ কিংবা মধ্যবিত্ত ও মর্কুটে
ছেঁড়াকাঁথা শব্দ ছিলো? লটারির স্বপ্নের গোলাপি
শব্দ ছিলো ঘামে ভিজে, ছাতা পড়ে নরম নৈরাশে?
জানিনা, কোথায় শব্দ জলজ্যান্ত মোহের ভিতরে,
গর্তে যেন সর্পশেষ, লেজ; কিংবা গন্ধের মতন
উষ্ণ ও প্রগল্‌ভ টান, গান যেন মৃদঙ্গ ভঙ্গুর।

BANGLADARSHAN.COM

মিষ্টিগুড়ের ইষ্টিশানে

এক পাড়াগাঁ থেকে আরেক পাড়াগাঁয়ে উঠে এলুম
রেলগাড়ি থামলো এসে মিষ্টিগুড়ের ইস্টিশানে
হাতে রইলো টোপর-ঝোপর, বড়ি-বেগুন, দাদুর লাঠি
লটবহর বলতে আরশুলা আর পোকায় কাটা প্রচ্ছদ ছেঁড়া
নোংরা বই
মনে রইলো টেঁ-টুঁই শঙ্খচিল বাগানভর্তি নারকেল গাছের
মাথায় ঝড়
উশিখুশি বাদলের দিন, বাদাবনে হাঁ-করা আলেয়া...এইসব

কলকাতায় চলে এলুম, প্রাণপণ ফাঁকা থেকে একটা ঝাঁকার

মধ্যে যেন
ঐ আলু-পটল মটরশাকের মনের সঙ্গে মন মেলাতে
চলে এলুম কলকাতায়
মাত্র ওটুকুই আজ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক, গা ঘষাঘষি
বাকিটা নাক-বরাবর দেয়াল গুমে-ভেজা জবড়জং বাড়িঘর
আর মাটি বিক্কিরি করে যায় ঠিক দুক্কুরের ফিরিওলা
বুড়ির মাথার পাকা চুল, দোরগোড়ায় ঘণ্টা নাড়ে পাটনাই ছাগল
কোথায় এলম্ হে-এ, এ কোথাকে এলম্
হর-ঘরকে ঝি-ঝিউড়ি গলি ভেজায় ঝেলম্
অর্থাৎ কিনা, মা-গঙ্গার জল রাস্তার দুপাশে নামছে ঝোরায়

পাথরের খোরায় দম্বল
মা রাঁধতেন অম্বল
চপাৎ-সপাৎ টানতুম।
টানতে-টানতে আঙুলগুলো বাধতো টাগরায়
একবার আগ্রায় গেলুম পুজোয়
পেতেনের ওপর কুঁজোয় থাকতো ফটিক জল
মা বলতেন, খোকা জানিস, ঐ জলের নাম জীবন
ঢোক্-ঢোক্ জল খা, খাবার-দাবার সময়ে খাবি

BANGLADARSHAN.COM

যখন যা পাবি, এখানে কেউ চায় না
আরশিকে বলে আয়না–
খোকা, ভদ্রতা বজায় রাখবি...

এক পাড়াগাঁ থেকে আরেক পাড়াগাঁয় উঠে এলুম
রেলগাড়ি থামলো এসে মিষ্টিগুড়ের ইস্টিশানে॥

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যুর মহান জাতিস্মর

সমস্ত সময় থেকে সময়ের বাহিরে দেখেছি
তোমার উজ্জ্বল রূপ, হে নিষাদ, হে মর্মঘাতক
একদিন; আজ তার ব্যাপকতা বিস্ময়বহতা
হিংসা, প্রতিশোধ নয়, শুধু এক একাগ্র হিংসার
রূপ দেখে, কান্তি দেখে আমরা ভিতরে বহ্নিমান–
এ কী অরাজক দিন বাংলাদেশে মুহূর্তে এসেছে?
একদিন অন্ধকারে কেঁদেছিলো আলোকের কবি
আজ জনপদে হয় বহ্ন্যুৎসব আলোর চিৎকার
ক্রমাগত কবি সুখী দেখে কেন আলোর সুস্থতা
এবং ঋষির মতো নিস্পৃহতা, পাথরের মতো।
এরই মধ্যে ভালোবাসা দৈনিক আপ্লুত হয় রসে
প্রকৃত তাত্ত্বিক ঘরে বসে পড়ে মার্কসীয় দর্শন
ভিতরে-বাহিরে দুই কোলাহল দু-মহাল গড়ে
প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে তৈরি হয় শব্দ রাতারাতি
বিমূঢ়তা থেকে ওঠে মৃত্যুর মহান জাতিস্মর॥

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যুর দাক্ষিণ্যহীন যেন দীর্ঘ দেবদারুবীথি

কে জানে বা কার ভুলে অতো বড়ো সুঠাম মহাল
ভেঙে ভেঙে টুকরো হলো, মণ্ডপে একাকী পায়রা জাগে
অভিশপ্ত দেবদারু টলোমলো ঐশ্বর্যে শিখর
দোলায় এবং সে-আলোছায়া দ্যাখে এক নগণ্য পথিক
বারবার, পথ ভুলে, ঐ পথে ফিরে ফিরে আসে–
মনে হয় ভেঙে-পড়া, টুকরো হাওয়া তার লাগে ভালো
কে জানে বা কার ভুলে অতো বড়ো সুঠাম মহাল
ভেঙে ভেঙে টুকরো হলো, মণ্ডপে একাকী পায়রা জাগে
অন্যেরা ঘুমায় আজ ক্লান্ত শুধুমাত্র বেঁচে থেকে
মৃত্যুর দাক্ষিণ্যহীন যেন দীর্ঘ দেবদারুবীথি
পথিকের কেউ নয়, মহালেরও কেউ নয় আর॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রত্যেকেই পৃথক বিপ্লবী

মানুষের মধ্যে আলো, মানুষের মধ্যে অন্ধকার
প্রত্যক্ষ করেছি কাল মধ্যরাতে হিংসার আড়ালে
যেন ইতিবৃত্ত ঠেলে আসা কোনো মর্মন্তুদ ছবি–
আক্রমণ, তরবারি, রক্তময় ভীষণ হিংস্রতা
তেমনি দেখেছি কাল মধ্যরাতে শিশুর সহিত
জেগে থেকে, কথা বলে গভীর, পুরনো, সাংকেতিক
ভাষায়, না শব্দ হয়, যাতে না দুজনে ধরা পড়ি।
দোষ নেই, তবু নষ্ট হতে হবে যেহেতু মানুষই!

মানুষের মধ্যে আলো, মানুষের মধ্যে অন্ধকার–
কেউ কেউ বেঁচে আছে, কেউ কেউ মৃত্যুর স্পষ্টতা
নিয়ে স্বাভাবিকভাবে স্তন্য দেয় নিজস্ব শিশুকে
গভীর, ব্যঞ্জনাময়, বিপ্লবের ধোঁয়া এই দেশে
মানুষের বৃদ্ধি, মায়া, কায়ক্লেশ প্রাণ নিয়ে খেলে
অধিকন্তু, নিজ শর্তে প্রত্যেকেই পৃথক বিপ্লবী॥

BANGLADARSHAN.COM

সুন্দরের বিকল্প

সুন্দরের কাছে থাকতো সুন্দরের বিকল্প একদিন।
আজ সব ভেঙে-চুরে পৃথিবীর গেরস্তের বাড়িঘরদুয়োরের মতো
নোনা ইট-তক্তা-কাঠ-ঝামা হয়ে গিয়েছে ছড়িয়ে...
সে আর বিকল্প নয় সুন্দরের; কিছু নয় আজ।

কিন্তু সে-স্তূপের পরে একদিন যদি গাছ ওঠে,
বৃষ্টির পীড়ায় ফুটে ওঠে ভাঁট করতালি দিয়ে
তখনি সুন্দর—তার সাজগোজ, বনের গম্ভীর
গন্ধ ও বাতাস বয়! অন্যপারে নতুন বাড়ির
বেড়াল কারণে ঘোরে তবু জনশূন্য ভাঙা মাঠে।
সে-ই কি সুন্দর তবে? সুন্দরের বিকল্প সুন্দরী?

BANGLADARSHAN.COM

দশমী

আগুনে তার মুখ পুড়েছে হঠাৎ যখন সন্ধ্যে
বাতাস খুঁটে গা খেয়েছে, ফাঁক ভরাতে মন দে
নয়তো পাঁচিল পড়বে টলে শেষরাতে তার সময় হলে
বাতাস বাঁধে ঝড়ের মাথা ধুলো-বালির গন্ধে
আগুনে তার মুখ পুড়েছে হঠাৎ যখন সন্ধ্যে।

জলের মধ্যে দেহটি তার মাছের দাঁতে কাটছে
উলুক ঝুলুক শালুক ফুলের পাতায় দেহ চাটছে
ভালোবাসায় হুলুস্থুলুস এই ভাবে তুই দুঃখ ভুলুস
পোড়া চাঁদের আকাশে মেঘ ঘুমের ভেতর ফাটছে
জলের মধ্যে দেহটি তার মাছের দাঁতে কাটছে॥

BANGLADARSHAN.COM

এই মেঘ থেকে বৃষ্টি

মনে হয়েছিলো এই মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে ঠিকই
মুখপোড়া বারান্দায় ভেসে যাবে সমস্ত নির্ভীক
স্বায়ত্তশাসন রক্ত, তার দাগ, মাত্র বলিদানে...
কলকাতায় আজ কে না জানে
মানুষের মধ্যে এক অবিমিশ্র খেলাধুলা হয়
রাত্রিদিন, সমস্ত সময়
প্রাণপণ।

ফুটপাতে বারুদ আর চাঁপার হলুদ মুখোমুখি
কে জানে কে জেতে হারে, কেবা দুঃখে সুখী
নির্জনতা ভালো, কিন্তু কতটুকু ভালো?
সন্ধ্যার চৌরঙ্গী যেন রাস্তায় স্থগিত ভুল মেয়েটির কালো
মুখশ্রী, নৈরাশা
চমৎকার রসে ভেজে পার্কে-পাতা পাশা
উড়েদের
কলকাতায় ঢের
আলুথালু বৃষ্টি হয়েছিলো গত শান্তির বছরে–
ফুটপাতে বারুদ আর চাঁপার হলুদ মুখোমুখি
তবু, এবছর বৃষ্টি, বৃষ্টি হবে ঠিকই।

অলিভ কামিজ আর কার্তুজ রাঙিয়ে যায় চোখ
হোক, ক্রমাগত মৃত্যু হোক–
একদিন বাঁচাবো নিভৃতে
সেদিন দূরত্বে নয় বড়ো
মানুষে-মানুষে মাপে কোষমুক্ত ফিতে
কার দোষ? কে করে বিচারও?
বশবর্তী স্নেহে আর সূত্রে আজই লেগেছে আগুন
সহসা কীভাবে।

BANGLADARSHAN.COM

দিন যাচ্ছে, যাবে
নতুন ইশকুলে আজ অস্ত্রশিক্ষা হয়
কী সহিংস কিশোর-হৃদয়
পাটের ফেঁসোর বাধ্য আঁটুলবাঁটুল টুকরো লোহা
যা দিয়ে বেঁধেছে বোমা তা সবই তারুণ্য-প্রাণঘাতী
সাংঘাতিক মন্ত্র এই অকস্মাৎ বিংশশতাব্দীর
কয়েকটি বছরে...
ঘরে ঘরে

মানুষ সর্বত্র শান্তিহীন
পথ চলে পিছনে তাকায়
কে যেন তাত্ত্বিক ছুরি নিয়ে চলে সবারই পশ্চাতে
সামনে-পিছনে ভয়, ভয় উর্ধ্বে নিচে
হাতে মাথা কেটে রাখে আবশ্যক পাগল পিরিচে
কেন? তা প্রকৃতপক্ষে জেনে রাখা প্রয়োজনই নয়
নতুন ইশকুলে আজ অস্ত্রশিক্ষা হয়
পোড়ে বই, ওড়ে চৈত্রে-শুকনো পাতাগুলো
এবং প্রাচীন বৃদ্ধ কাটামুণ্ড ধুলোয় লুটোয়
বিপ্লব এভাবে শুরু, জানি না কী অঙ্কে যবনিকা?

অথচ আমার ঘর থেকে ও-ই বাইরে এসেছে
স্বপ্ন ও সমৃদ্ধ ওকে গড়েছিলো বড়ো সাধ করে
একদিনে পালটে গেলো, ফুলে উঠলো রগের শিকড়
ঠাণ্ডা স্পর্ধাভরা এক তাচ্ছিল্যে আমায় ঠেলে দিয়ে–
ও আমার প্রিয়তম সহোদর, মিশে গেলো ভিড়ে
এবং মিশলো না–একা পড়ে থাকলো পাথরের মতো
নীরব, করিতকর্মা, সমুদ্রের মৌন ও গভীর।

কেন করে? ওরা কেন করে?
স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে বসে থাকি যেন এই ঝড়ে
দাঁড়াতে পারবো না আর,
টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবো, ধ্বংস হবে মাথা
মেলাতে পারবো না দুই সহোদর প্রাণের প্রণেতা

BANGLADARSHAN.COM

আমি ও আমার ভাই
দুজনের স্বাতন্ত্র্যও চাই, দুজনের দুই রাজনীতি
দুটি পথ–দুজনেই যাবো
ও পথে করবে না দেরি, আমি দ্রুত যাবো
যদি পারি।

দিন যাচ্ছে, যাবে
প্রকৃত কি যাচ্ছে দিন? থেমে নেই? স্থবিরতা নেই?
মৃত্যুর মহান আসে জীবনের তুচ্ছতার কাছে॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥